MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

The Role of Folk Deities in the Rural Society of Purulia: In the Perspective of Religious Beliefs and Cultural Life

পুরুলিয়ার গ্রামীণ সমাজে লোকদেবতার ভূমিকা : ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে

Rajib Mahata

Research Scholar, Dept. of Sanskrit
Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal, India.
Email: rajibmahata0012@gmail.com
Page No: 154-159

Abstract: *Purulia is a culturally diverse district of West Bengal. The coexistence of various tribal and ethnic communities in this district is reflected in its multifaceted folk culture. Folk deities are intimately interwoven with the religious beliefs, rituals, festivals, and everyday lives of the rural scheduled communities in this religion. The worship ceremonies, devotive offerings (mānat), vows (vrata), village fairs, folk songs, folklore, and folk dances centered around these deities form an integral part of the religious life and cultural heritage of the rural folk. This paper explores the role of folk deities among the marginalized rural scheduled communities of Purulia district, examining their religious faith, ritualistic practices, and the profound influence of these deities on their cultural life. Additionally, it analyzes how communal harmony, participation across diverse religious groups, and cultural inheritance are nurtured around the veneration of these folk deities. Furthermore, the study addresses the contemporary transformations witnessed within this folk deity-centric culture in the wake of modernization, urbanization, and evolving lifestyles.*

Keywords: *Purulia, West Bengal, Folk Culture, Folk Deities, Rituals, Rural Society, Religious Beliefs, Cultural Heritage.*

ভূমিকা :

সমাজ সৃষ্টি হওয়ার সময় থেকে মানুষের জীবনের সঙ্গে দেব-দেবী ও ধর্মীয় আচার-আচরণ ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত, ঠিক একইভাবে পুরুলিয়ার সমাজ ও জনজীবনে দেবদেবীর প্রভাব ও অনস্বীকার্য্য। বৈদিক, পৌরাণিক দেব-দেবীর পাশাপাশি বহুধরনের লোকদেবতার ধর্মীয় পূজা-অর্চনা এখানে হয়ে থাকে। বাংলার লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক জীবনে লোকদেবতা এক অনন্য স্থান জুড়ে আছেন। তাঁরা মূলত প্রচলিত বৈদিক বা শাস্ত্রীয় দেব-দেবীর চেয়ে কিছুটা আলাদা। লোকদেবতা বলতে মূলত কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দ্বারা পূজিত স্থানীয় দেবতা বা দেবীকে বোঝায়। যে সকল পূজা-পদ্ধতি আচার ও আচরণ এই সকল লোকদেবতাদের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়, এগুলি সম্পূর্ণভাবে এঁদের নিজস্ব অন্যান্য দেব-দেবীর থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। এই সকল দেবতাদের উদ্ভব মূলত সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, স্থানীয় ঐতিহ্য, লোকাচার, দীর্ঘদিনের প্রথার ভিত্তিতে এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন থেকে হয়েছে। এঁদের পূজা প্রাচীনকাল থেকে গ্রামবাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। লোকদেবতার ধার্মিক স্বরূপ মূলধারার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মানুষের বাস্তব জীবনের চাহিদা, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায়। এই সকল দেবতাদের পূজা গ্রামাঞ্চলে বেশি হওয়ার কারণে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, কৃষিকাজ, স্বাস্থ্য, বৃষ্টি, ফসল, রোগ-ব্যাধি ও পারিবারিক মঙ্গলের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। লোকজীবনে তাঁদের স্থান অত্যন্ত গভীর এবং তাঁদের ধার্মিক স্বরূপ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই লোকসমাজ মূলত গ্রামে বসবাস করার ফলে গ্রামবাসীরা তাঁদেরকে গ্রাম্যদেবদেবীও বলে থাকেন।[1] এই দেবদেবীদের আবির্ভাবকাল নির্ধারণ করা যায় না। শোনা যায়, মানুষ জন্মের অব্যবহিত পরেই এদের পূজা আরম্ভ হয়। এইরূপ অনুমানের ভিত্তিতে এঁরা বৈদিক বা পৌরাণিক দেবদেবীদের থেকেও অনেক প্রাচীন। এঁদের সংখ্যাও গণনাতীত - গ্রামে গ্রামে নানা নামে এঁরা প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পূজিত।[2] পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ সমাজের মধ্যে বসবাসকারী অনুসূচিত সম্প্রদায় এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকার মানুষের জীবন প্রকৃতি, কৃষি, বন, পশুপালন, ঋতুচক্র এবং স্থানীয় সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তাঁর ফলে তাঁদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্থানীয় দেবতা, দেবস্থান, পবিত্র বৃক্ষ, পবিত্র স্থান এবং বিভিন্ন লোকাচারের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই সকল দেবতাদের পূজা কোন ব্যক্তির কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের প্রকাশ নয়। অনেক ক্ষেত্রে তা একটি গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত অনুষ্ঠান। এই পূজা উপলক্ষে সকল মানুষ

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

একত্রিত হয়, বিভিন্ন ধরনের মেলা বসে, গান ও নৃত্যের আয়োজন হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক পুনর্গঠিত হয়। এর ফলে লোকদেবতার অধ্যয়ন ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতির অধ্যয়নের ক্ষেত্রও তৈরি করে।

লোকদেবতা : স্বরূপ ও ধারণা:

লোকসমাজের আধারে যে 'লোক' তাঁর আরাধ্য দেবতাকেই বলা হয় লোকদেবতা। সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতিদিনের একান্ত কামনা বাসনা মেটানোর তাগিদে কিংবা ভয়জনিত ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় প্রণাম জানায় ও পূজা দেয়, তাঁরা হলেন লোকদেবতা। লোকসমাজের দৈনন্দিন ওঠাপড়া, তাঁর হাসিকান্নার সাক্ষী থাকেন এই লোকদেবতারা। ভয়ভীতির সাথে 'আপন মনের মাধুরীও' লোকদেবতার রূপ সংগঠনে সহায়তা করে। উগ্রমূর্তির লোকদেবতাদের শরীর যখন ধুতি চাদরে সেজে ওঠে তখন তাঁর মধ্যে মিশে থাকে লোকসমাজের সেই আপন মনের মাধুরী। সাধারণ মানুষ যখন নিজেকে রক্ষা করতে ব্যাকুল হয়েছে, ঠিক সেই সময় থেকে তখনো সভ্যভব্য হবার প্রশ্নই ওঠেনি, তখন থেকে চলছে এঁদের পূজা। 'লোক' এই কথাটির দ্বারা তা প্রমাণিত হচ্ছে। এঁর প্রচলিত অর্থ হল 'গ্রামের সাধারণ মানুষ'। সমাজ সৃষ্টির সময় থেকে গ্রামীণ আদিম সমাজের মানুষের এক ধরনের মনের বিশ্বাস থেকে উদ্ভব হয়েছে 'লোকদেবতা' শব্দটি। তবে প্রথম দিকে হয়তো 'লোকদেবতা' নামটিই ছিল না। কিন্তু সেই আদিমকালে মানুষ যখন নিজ শক্তিতে নিজেকে রক্ষা করতে অসহায় বোধ করেছিল, এবং নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য তাঁর থেকে অধিক শক্তিসম্পন্ন কোনো কিছুকে চিন্তা করতে শিখেছিল, তখন সেই সংকটময় মুহূর্তে তাঁর মনে যিনি জন্মেছিলেন, তিনি হলেন 'লোকদেবতা'। নিজেদের চিন্তা-ভাবনা অনুসারেই আদিম মানুষগন তাঁকে রূপ দিয়েছিলেন নিজেদের মনের মতো করে। কালে কালে, স্থানে স্থানে মানুষের মনের বিবর্তন অনুযায়ী সে দেবতার নানা পরিবর্তন ঘটেছে অবশ্যই, কিন্তু মানুষের কাছে আকাঙ্ক্ষা পূরণের সামর্থ্যটির ছেদ পড়েনি। মানুষ মনে মনে যা চেয়েছে, তাঁর কাছে দেবতা হয়ে উঠেছে ঠিক সেই শক্তির আধার। বিভিন্ন স্থানে গ্রামে-গঞ্জে মানুষের সেই কামনা পূরণের দেবতারাই পরবর্তীকালে লোকদেবতা, গ্রামদেবতা, লৌকিক দেবদেবী নামে অভিহিত হয়েছেন।[3] এই সকল দেবতারা কিন্তু পুরোহিতদের পূজা পাওয়ার করুণার উপর নির্ভর করেননি, অনুসূচিত সম্প্রদায়ের লোকেরাই হয় এর পূজারি।

লোকদেবতার পূজায় অংশগ্রহণকারী অনুসূচিত সম্প্রদায়ের আদিম অধিবাসীরা সাধারণত শিকারজীবী হলেও তাঁরা পরবর্তীসময়ে অরণ্যনির্ভর কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে তাঁদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করতে হয়েছে নানাপ্রকারের প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশের সঙ্গে। পাশাপাশি লড়াই করতে হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি এবং অরণ্যচারী বিভিন্ন হিংস্র জীব-জন্তুদের সঙ্গে। শিকারজীবী অবস্থার সময় অরণ্যের বিভিন্ন হিংস্র পশুর আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন তাঁদের করতে হয়েছিল তেমনি প্রস্তর খণ্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই সকল লোকজীবন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিল। তাঁর কারণ, নানা ধরনের প্রতিকূল শক্তি, দৈব-দুর্বিপাক সহ বন্যহিংস্র জন্তুদের হাত থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। এর পাশাপাশি প্রাকৃতিক দিক থেকে অরণ্যেঘেরা, ঊষর, ধূসর, রাঙামাটি-পাথুরে আবহাওয়া অধ্যুষিত এখানে মূলনিবাসী দ্রাবিড় ও আদি-অষ্ট্রেলীয় শ্রেণী গোষ্ঠীর যূথবদ্ধ মানুষজনেরা জীবনযাত্রায় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সুখ-শান্তির আশায় ভরসাস্থল ও রক্ষাকর্তা হিসাবে বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর কল্পনা করেছিল। নিজের এবং সমাজের মঙ্গলকামনায় শুভাশুভের ভার নিঃসঙ্কোচে অর্পন করেছিল কল্পিত দেব-দেবীর চরণপ্রান্তে নিজেদের ভক্তির বরমাল্য দিয়ে। বিভিন্ন ধরনের দেবতা ও উপদেবতার কল্পনা করে এই অরণ্যাচারী শিকারজীবী ও কৃষিজীবী শ্রেণীর আদিম মানুষেরা নিজেদের ভালমন্দের ব্যবহারিক ব্যাপারের নিয়ন্ত্রাশক্তি হিসাবে এই দেবতা-উপদেবতাদের তুষ্ট করতে পারলেই মঙ্গললাভ। অনুসূচিত সম্প্রদায়ের আদিম অধিবাসীরা এই সত্য বা বিশ্বাস সম্মুখে রেখে এই শক্তির উপাসনা করতে শুরু করেছিল। এই সকল জনজাতিদের লোকদেবদেবীদের পূজা প্রচলনের বাস্তব উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে গিয়ে নৃ-তত্ত্ববিদ্ বলেছেন—

"That primitive worship has primarily a practical aim is seen from the fact that the lower peoples generally worship only those spirits or deities who are supposed to influence human affairs. The real reason why the supreme beings are not, as a rule, worshipped, is their indifference to the course of nature and the life of man."[4]

অর্থাৎ তাৎক্ষণিক ফল লাভই ছিল এই সকল লোকদেবতা গুলির পূজার মূল উদ্দেশ্য। লোকজীবন তাৎক্ষণিক লাভালাভের ভিত্তিতে 'ধনজন মান চায়'। এই লোকদেবতারা ফল প্রদানের ক্ষেত্রে অতীব সক্রিয়। ভক্তির বরমাল্যে নিবেদন করেছে তীব্র হৃদয়াকুতি। প্রতিষ্ঠিত করেছে রাস্তার পাশে কোন গাছের নীচে, জঙ্গলের মাঝখানে, নদীর কিনারে

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

কোন গাছের তলায় বা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মাঝখানে এই সকল দেব-দেবীর অধিষ্ঠান। নিজেদের ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রাবল্যবশত মূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে কোথাও কালপাথর কোথাও বা সাদাপাথর। যে পাথরকে তাঁরা বন্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বা বিভিন্ন পশুপক্ষী শিকার করবার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করতে ব্যবহার করত, সেই পাথরকেই তাঁরা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি হিসাবে কল্পনা করেছিল। লোকচেতনায় প্রবল ভক্তি ও বিশ্বাসের আধিক্যে এক একটা সাদা বা কাল পাথর বিভিন্ন নামধারী দেব বা দেবীর মূর্তি হয়ে উঠেছিল।

এই সকল লোকদেবতাদের পূজা ও পৌরাণিক দেবতার পূজার মধ্যে উপাসনার ধরন ও সামাজিক ভূমিকার ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে যেমন- পুরুলিয়া জেলার চাকদার দেশোয়ালী মা, চিলার মাটি ফেলা ঠাকুর, আঁকরো গ্রামের জট্যাসিন্নী লোকদেবতা পরবর্তীকালে বৃহত্তর হিন্দু ধর্মীয় পরিসরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের পরিচয় বা পূজা-পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে।

পুরুলিয়ার গ্রামীণ সমাজ ও লোকসংস্কৃতি:

পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ সমাজ বহু জাতি, জনগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। কুড়মি, সাঁওতাল, সর্দ্দার, শবর, মুণ্ডা, কোলসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজস্ব বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। গ্রামীণ সমাজের মধ্যে প্রকৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পর্কও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পাহাড়, বন, নদী, জলাশয়, বৃক্ষ ও কৃষিজমি যুক্ত হওয়ায় এগুলিকে ঘিরে বিভিন্ন পবিত্রতা ও বিশ্বাসের ধারণা গড়ে উঠেছে।

এই লোকদেবতারা গ্রামীণ সমাজে গ্রাম্যদেবদেবী যিনি একটিমাত্র নামে, একটিমাত্র থানে, একটিমাত্র গ্রামে মূলত সেই গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা পুরুষানুক্রমে পূজিত হচ্ছেন। গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে তিনি হলেন গ্রামটির স্রষ্টা ও অধীশ্বর দেবতা। গ্রামের প্রত্যেকটি শুভাশুভ কাজকর্মে সুখেদুঃখে আচার আয়োজনে সর্বপ্রথম তাঁরই পূজো হয়। গ্রামের প্রতিটি কাজকর্মে তাঁর সুদৃষ্টি ও কুদৃষ্টি আছে। গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষদের মতো এই সকল দেবী-দেবতারা থাকেন গ্রামের প্রান্তে, বাসস্থানহীন মানুষজনের মতো এঁরাও থাকেন গাছতলায়, খোলা আকাশের নীচে। বুভুক্ষু মানুষদের মতো তাঁদের প্রতিদিন চাল-কলা নৈবেদ্যের প্রয়োজন পড়ে না, বছরের এক আধদিন একটু ভালোমন্দ পেলেই তাঁরা খুশি হন। অবশ্য এখানে মানুষ ও দেবতার মধ্যে ভক্তির থেকে ভয়ই প্রধান। দেবতা রুষ্ট হলে 'গ্রাম জ্বালিয়ে দেবেন' – এমন ধারণা প্রচলিত আছে। তাই বছরের এক-দু' দিন 'জাঁতাল' বা 'গাজন' ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে তাঁদের তুষ্ট রাখতে হয়। নানারকম শারীরিক নির্যাতন থাকে তাতে, তাসত্ত্বেও মনের মধ্যে থাকে দেবতাদের প্রতি তুষ্ট কামনা। এই ধরনের গ্রাম্য সংস্কৃতির অভিব্যক্তি হচ্ছে লোকধর্ম, মানুষের জীবনচেতনা, ভয়ভীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে লোকদেবতার।

এই সকল গ্রামীণ সমাজের লোকদেবতাকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন ধরনের লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে রয়েছে লোককথা, লোকগান, লোকনৃত্য, বাইনাচ, টুসুনাচ, জাওয়া-করম নৃত্য, ভাদু গান, ছৌ, ঝুমুর, মেলা, উৎসব এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। এই সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে লোকদেবতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকদেবতা:

আদিম মানুষের এই ভয়-ভক্তির মানসজাত হল লোকদেবদেবীগুলি। তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রেখে কৃপা লাভ করার জন্যই এই লোকদেবতাগুলির উদ্ভব। বিভিন্ন ধরনের নাম দিয়ে 'থান' প্রতিষ্ঠা পূজানুষ্ঠানের প্রচার। আদিবাসী বা অনুসূচিত সম্প্রদায়ের পূজিত এই সকল গ্রাম্য লোকদেবতাগুলির প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবজ্ঞা ছিল। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এই লোকদেবতা এবং গ্রামদেবতার দল হলেন পতিত দেবতা। মনুসংহিতায় এই ধরনের সকল লোকদেবতার পূজারীদেরকে পতিত নামে অভিহিত করা হয়েছে।[5] কিন্তু কোন ধরনের বিধান, কোন বিধিনিষিধেই এঁদের পূজা বন্ধ করতে আজও পারে না, আগেও পারে নাই। তাই ব্রাহ্মণ্যরীতি শাসিত কোনো নীতিনিয়ম নেই। নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত নেই। মন্ত্র নেই, পূজা উপাচারের বাহুল্যও নেই। যিনি পূজা করেন তাঁকে আদিবাসী সমাজের লোকজন নিজেরাই এই 'লায়া' পুরোহিতকে ঠিক করেন। তবে লায়া ছাড়াও নিজেরা শুদ্ধ-শান্তি ভাবে পূজা করার অধিকারও পায়। মন্ত্রের বালাই নেই। হৃদয়ের মধ্যে যে ভয় ও ভক্তি তা মন্ত্রের কাজ করে। 'লায়া' একবেলা উপোস করে স্নান সেরে, কাছা দিয়ে গামছা পরে পূজোয় বসে। পূজো শেষ হওয়ার পর লায়ার খাবার অধিকার থাকে। ভক্তদের দেওয়া ঘি, গুড়, আতপ চাল, ধূপ, সিন্দুর সহ সামান্য পূজো উপাচার দিয়ে মন্ত্র ছাড়াই পূজা করে মূর্তিহীন দেবদেবীকে। কোথাও কাল পাথর, কোথাও বা সাদা পাথর বিভিন্ন দেবদেবী নামাঙ্কিত হয়ে পূজিত হয়। আসলে আদিবাসীরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী নয়, তাঁরা মূলত প্রকৃতির পূজারী। আত্মরক্ষার হাতিয়ার যে পাথর তাঁকেই তাঁরা তাঁদের রক্ষাকর্তা হিসাবে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করে দেব বা দেবী নামে

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রস্তর যুগের মানুষেরা প্রস্তর খণ্ডকেই নিজেদের রক্ষাকর্তা শক্তি হিসাবে কল্পনা করেছে। প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে যে দাহিকাশক্তির আগুন আছে— প্রথম আদিম মানুষই আবিস্কার করেছিল বলে সেই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন প্রস্তরখণ্ডকেই ঐশী শক্তির মহিমায় ভূষিত করেছিল। যে প্রস্তরখণ্ড দিয়ে নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করে জীবিকা ও আত্মরক্ষা এবং প্রস্তরখণ্ড ঘষে আগুন জ্বালানো দেখেই প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে দেবী মহিমা কল্পনা করে মূর্তি বদলে বিভিন্ন দেবদেবী নামে পাথরকে পূজা করতে আরম্ভ করেছিল। ফলে ব্রাহ্মণ্য তথা আর্য সংস্কৃতির মতো দেবদেবীগুলির মতো কোনো মূর্তি নেই। পূজার সাধারণ নৈবেদ্যের সঙ্গে ভক্তরা উপহার হিসাবে মাটির তৈরি হাতি বা ঘোড়া 'ছলন' দেয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এই হাতি, ঘোড়ার পিঠে চড়েই রাত্রিবেলা তাঁদের আরাধ্য দেবতা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়। নানারকম অমঙ্গল, অশুভের হাত থেকে রক্ষা করে। সেই কারণে থানগুলি মাটির হাতি-ঘোড়ায় স্তূপাকারে পরিণত হয়। সাধারণ নৈবেদ্য ও মাটির তৈরি হাতি-ঘোড়া অর্পনের পাশাপাশি ভক্তরা বিভিন্ন ধরনের পশু-পক্ষী বলি দেয়। বিভিন্ন দেবদেবীর রীতি অনুযায়ী এই বলিদান নির্দিষ্ট হয়। যেমন— 'বিরহি ঝাঁপড়ি' থানে শূকর বলি হয়। 'গুঁসাইরায়' থানে লাল মোরগ পায়রা বলি হয়। 'দুয়ারসিনি' থানে মোরগ, পায়রা, পাঁঠা, ছাগল, ভেড়া বলি দেওয়া হয়। 'চড়কাসিনী' লোকদেবতার থানে শুধুমাত্র সাদা ছাগল পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। 'কুদরাসিনি' লোকদেবতার থানে কাল রঙের মোরগই বলি দেওয়া হয়। 'পিটিঠাকরান'-র থানে শুধুমাত্র পাঁঠি ভেড়া বলি দেয়। মন্ত্রের ব্যবহার নেই। অন্তরের ভক্তিই আসল। শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে দেবদেবীগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে উঠে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্য করা হয়েছে 'লায়া' যেন দেবদেবীগুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। বলিদানের পূর্ব মুহূর্তে বলি প্রদত্ত পশু বা পক্ষীটির মাথায় জল ছিটিয়ে 'থানে'র সিন্দুর মাথায় পরিয়ে দেয়। আবার কোন কোন লোকদেবদেবীর থানে বলিদান নিষিদ্ধ। সাধারণ নৈবেদ্যের সহযোগে এই সকল লোকদেবদেবীগুলি পূজিত হয়। যেমন— 'চিড়াখাওকি'-র পূজায় বলি হয় না। ভোগ হিসাবে গুড়-চিড়া -দই-কলা অর্পণ করা হয়। মরগাঠাকুর-এ পুরোহিত বা লায়া নেই। ভক্ত মহিলা নিজেই পূজা করে গুড়-ঘি-আতপচাল-মধু-সিন্দুর দিয়ে। মাটির হাতি-ঘোড়াও লাগে না, বলি দানও নেই।[6]

লোকদেবতা ও সামাজিক জীবন:

লোকদেবতারা হল লোকসম্প্রীতি ও লোক জীবনচর্যার উৎস। সেকালে এই ঠাকুরদেবতা ছাড়া এঁর প্রচলন সম্ভব ছিল না। এই জন্য উৎসব ও মেলার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রায় সব দেবদেবীকে ঘিরেই পূজো, সঙ্গে সঙ্গে উৎসব পার্বণ ঘটা করেই ঘটে অনেক থানেই মেলা বসে। মেলার মধ্যে তীর ছোঁড়া, মুরগী লড়াই, দৌড় ঝাঁপ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান ইত্যাদির সাথে সাথে মদ, গাঁজা, ঝাণ্ডু এবং আপত্তিকর মেলামেশাও লক্ষ্য করা গিয়েছে তা সত্ত্বেও মেলাগুলি যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, প্রজাতি, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকলকে প্রীতির আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছে।[7]

লোকদেবতাদের পূজার স্থল অনেক সময় বিভিন্ন ধর্মের মিলনস্থল হিসেবে কাজ করে। অনেক লোকদেবতাকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রদ্ধা করেন। যেমন- পুরুলিয়া জেলার মানবাজার-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বোরো থানার আঁকরো গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধনের উদাহরণ হিসেবে কালু শেখ নামে একজন মুসলমান সম্প্রদায়ের পূজারীর দ্বারা মা মনসার পূজা করা হয়। এই পূজা শতাব্দী প্রাচীন আনুমানিক প্রায় ২০০ বছর পূর্বের থেকে চলে আসছে। বিভিন্ন ধরনের জাতমঙ্গল, মনসামঙ্গল বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সময় উৎসব মুখর হয়ে ওঠে এই গ্রাম। এখানে হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত ভাবে অংশগ্রহণ করেন।[8]

এই ভাবে পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ সমাজে লোকদেবতার পূজায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করা। গ্রামের মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণে সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়। পূজার প্রস্তুতি, অর্থসংগ্রহ, অনুষ্ঠান পরিচালনা, অতিথি আপ্যায়ন এবং মেলার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজে সম্মিলিত অংশগ্রহণ দেখা যায়। এই কারণে এই সকল লোকদেবতার পূজার স্থল কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা সামাজিক সম্পর্কের পুনর্গঠন এবং সমষ্টিগত পরিচয় প্রকাশের একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে।

লোকদেবতা ও সাংস্কৃতিক জীবন:

লোকদেবতাদের ঘিরে বিভিন্ন ধরনের লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যাঁর কারণে এই দেবতার পূজাস্থলকে লোকসংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়। এই সকল সংস্কৃতিতে অনুসূচিত সম্প্রদায় মানুষের জীবন, আচার-অনুষ্ঠানমূলক ক্রিয়াকলাপ এবং শিল্পসত্তার নানা পরিচয় ফুটে ওঠার মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পকলা সমৃদ্ধ হয়েছে। যাঁর মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে তাঁদের জীবন, জীবিকা, চরিত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি।

বিশেষত ছৌ, ঝুমুর, নাটুয়া এবং অন্যান্য লোকশিল্পের বিভিন্ন পরিবেশনে স্থানীয় দেবতা, লোককথা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব দেখা যেতে পারে। লোকগান ও লোককথার মধ্য দিয়ে দেবতার মাহাত্ম্য, অলৌকিক কাহিনি, সামাজিক

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

মূল্যবোধ এবং মানুষের জীবনসংগ্রামের নানা দিক প্রকাশ পায়। এই ভাবে লোকদেবতা ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজের মানুষের কাছে লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পেরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠেন।

আধুনিকতার প্রভাব:

একদা, এই সকল দেব-দেবীগণ কেউ আলাদা ভাবে থাকত না। বিশেষ বিশেষ গাছের তলায়, পুকুরের পাড়ে, গ্রামের শুরু বা শেষ প্রান্তে এদের অধিষ্ঠান ভূমি ছিল। ভয়ের দেবী রূপে চণ্ডী, শীতলা, রঙ্কিনী, মনসা প্রভৃতি অপৌরাণিক দেবীগণ বর্তমান সময়ে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করছেন। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত দেব-দেবীগণ বর্তমান সময়ে ঠিক লোকদেব-দেবী পর্যায়ে নেই। ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় অন্যান্য শিব, দূর্গা, কালী প্রভৃতি পৌরাণিক দেব-দেবীদের মধ্যে এই সকল লোকদেবতার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই সকল দেব-দেবীদের জন্য সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো মন্দিরাদি নির্মিত হত না। গ্রাম-সীমান্তের কোন বৃক্ষকে অথবা বৃক্ষের তলাকে এই সকল দেব-দেবীর অধিষ্ঠানভূমি বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু কালক্রমে এই সকল লোকদেবতাদের অধিকাংশই পৌরাণিক রূপ পরিগ্রহ করে পুরোহিতপুষ্ট হয়ে ওঠে এবং হিন্দু দেবদেবীদের নিচের তলায় স্থান দখল করে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অন্য একটি অধ্যায়কে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।[9]

বর্তমান সময়ের আধুনিক শিক্ষা, নগরায়ণ, প্রযুক্তি, গণমাধ্যম এবং পরিবর্তিত জীবনযাত্রার ফলে লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে কিছু ঐতিহ্য দুর্বল হচ্ছে, আবার কিছু লোকাচার নতুন রূপে পুনর্গঠিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে স্থানীয় পূজা এখন বৃহত্তর সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। অতীতে যেসকল মেলা ও উৎসব লক্ষ্য করা যেত সেই সকল বর্তমানে পরিবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় দেবতা ও উৎসবের পরিচিতি বৃহত্তর পরিসরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে এই রূপ পরিবর্তনের মধ্যেও লোকদেবতা-কেন্দ্রিক বহু বিশ্বাস ও আচার স্থানীয় মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ হিসেবে অস্তিত্ব রয়েছে।

সমীক্ষার ফলাফল:

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে—

- লোকদেবতাদের গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক।
- মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের বিস্তার।
- স্থানীয় এলাকার লোকাচার ও প্রথার গুরুত্ব।
- গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক।
- বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি, আত্মরক্ষা, ফসল, বৃষ্টি, পশুসম্পদ, সন্তানলাভ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের বিশ্বাস ও প্রত্যাশার সঙ্গে সংযোগ।
- লোকমেলা, লোকউৎসব, লোকগান ও লোকনৃত্যের সঙ্গে সম্পর্ক।
- লোকদেবতা শাস্ত্রীয় সম্মত দেবদেবী নয়। এঁদের পূজার মন্ত্র শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়।
- বিশেষ অঞ্চলেই বিশেষ লোকদেবতা পূজা পেয়ে থাকেন।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও মূর্তি থাকে না – পাথর, শিলাখণ্ড. গাছ, মাটির ঢিবি, ঘট বা বেদীতেই পূজা হয়ে থাকে।
- পূজানুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় আচার পালিত হয় না প্রায়ই।
- আয়োজকেরা নিজেদের মধ্যে থেকে পূজারী (লায়া) নির্বাচিত করে থাকেন।
- লোকদেবতাদের অবস্থান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গাছতলায়, নির্জন মাঠে বা চালা ঘরে।
- লোকবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন লোকদেবদেবীর।
- গ্রামের সহজ সরল মানুষদের অন্তরেই এই সকল দেবদেবীর অবস্থান।
- গ্রামের এই দেবদেবীরা অভয় দান করে, আপদ বিপদে রক্ষা করে, আয়ু দেয়, আরোগ্য দান করে, সকলকে সুখে রাখে।
- লোকদেবতাদের কল্যাণে গড়ে উঠেছে বহু লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোকপালা-গান, যাত্রা, নাটক, ছড়া, কবিতা, গান ও ব্রতকথা।
- অঞ্চলভেদে একই লোকদেবতাদের পূজা পদ্ধতি বা উৎসবের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।
- লোকদেবতার পূজা সামাজিক সংহতি ও সমষ্টিগত অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।
- আধুনিকতার প্রভাবে লোকদেবতা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটলেও এর বহু উপাদান এখনও স্থানীয়

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ।

উপসংহার:

পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই লোকদেবতাদের ভূমিকা বহুমাত্রিক। তাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি, তাঁদের ঘিরে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, লোকাচার, উৎসব, মেলা, লোকসাহিত্য এবং লোকশিল্পের নানা ধারা বিকশিত হয়েছে। এই সকল লোকদেবতার পূজা ও সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান গ্রামীণ সমাজের মানুষের বিশ্বাস, আশা, ভয়, প্রকৃতিনির্ভর জীবন এবং সমষ্টিগত পরিচয়ের নানান দিক প্রকাশ করে। অতএব, পুরুলিয়ার লোকদেবতার অধ্যয়নকে কেবল ধর্মীয় অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজ, সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও পরিবেশের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন।

Endnotes

1. "গ্রামদেবং গ্রামপালং গ্রামোপদ্রবনাশকম্। গ্রামরক্ষাকরং গ্রামং গ্রামদেবং নমাম্যহম্।।"- মাহাতো, ক্ষীরোদ চন্দ্র। *মানভূমের আদিবাসী লোকদেবতা*। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, 2011। পৃ.- 6
2. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী। *আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, 1992। পৃ.- 15
3. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী। *আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, 1992। পৃ.- 14
4. Karsten, Rafael. The Origins of Religion. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. Broadway House, 68-74 Carter Lane, E.C. 1935. Page- 20
5. করণ, সুধীরকুমার। *সীমান্তবাঙলার লোকযান*। কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, 1371। পৃ.- 249
6. মাহাতো, ক্ষীরোদ চন্দ্র। *মানভূমের আদিবাসী লোকদেবতা*। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, 2011। পৃ.- 31
7. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী। *আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, 1992। পৃ.-6
8. Purulia খাস খবর 20/08/26।
9. করণ, সুধীরকুমার। *সীমান্তবাঙলার লোকযান*। কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, 1371। পৃ.- 249

Bibliography

- Basu, Gopendrakrishna. Bāṁlār(a) Laukik(a) Devatā. Kolkata : Dey's Publishing, 1966.
- Bhattacharya, Ashutosh. Bāṁlar(a) Lokaśruti . Kolkata : Puragami Prakashan, 1960.
- Chakraborty, BarunKumar. Lokoutsob O Lokadevatā Prasanga. Kolkata : Pustak Bipani, 1984.
- Dey, Dilip Kumar. Cooch Behārer Lokasaṁskriti. Kolkata : D. Kar, Anima Prakashani, 2000.
- Choudhury, Pallab Sengupta. Dulal. Lokasaṁskritir Viswakosh. Kolkata : Pustak Bipani, 2004.
- Ghosh, Mita. Puruliyār(a) Loka Saṁskriti. Kolkata : Akshar Prakashan, 2010.
- Jana, Debprasad. Ahalyābhumi Puruliā. Kolkata : Deep Prakashan, 2004.
- Kamilya, Mihir Choudhury. Ānchalik Devatā : Loko Saṁskriti. Kolkata : Burdwan University, 1992.
- Kamilyya, Mihir Choudhari. Rāher Purbapurus Pujā. Kolkata : Bholanath Prakasani, ১৩৯৮.
- Kar, Tapan. Asāmānya Puruliyā. Kolkata : Ananda Publishers Private Limited, n.d.
- Karan, Sudhir Kumar. Simānta Bāṁlar Lokayāna. Kolkata : Karuna Prakasani, ১৩৭১.
- Mahato, Kshirod Chandra. Mānbhumer(a) Ādibāsī Lokadevatā. Kolkata : Bangiya Sahitya Samsad, 2011.
- Mandal, Sabyasachi. Rārh Baṁlar Lokosaṁskriti. Kolkata : Dey Publications, ১৪২৫.
- Naskar, Debabrat. Baṁlār(a) Lokadevatā O Samājasaṁskrti. Kolkata : Ananda Publishers, 2018.
- Naskar, Debabrata. 24 Parganār LouKik(a) Devadevī : Pālāgān O Lokasaṁskrti Jiggāsā . Kolkata : Farma K L Mukhopadhya, 1999.
- Roy, Subhas. Puruliyār(a) Laukik(a) Devadevī. Birbhum : Rarh Prakashan, 2016.
- Shantikari, Arup. Mānbhumar Lokasaṁskriti-Lokasāhitya. Kolkata : Ekussatak, 2018.